

গোষ্ঠীতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র : বাংলা রূপকথায় রাজা নির্বাচনের প্রেক্ষিত

দিতিপ্রিয়া দাশগুপ্ত

সারসংক্ষেপ : রূপকথা ইতিহাসের পালাবদলের সাক্ষী। প্রাচীন ইতিহাস, যার সাহিত্যিক নিদর্শন ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না; রূপকথা সেই সাহিত্যেরই একটি অঙ্গ। আবার বাংলা রূপকথার বিশ্লেষণে আমরা দেখি, অধিকাংশ রূপকথাতেই মূল সমস্যা আবর্তিত হয় রাজ-সিংহাসনকে কেন্দ্র করে। এই কাহিনিগুলিতে বিরুদ্ধ শক্তিগুলির মূল আক্ৰোশ রাজ্যের উত্তরাধিকারীর উপরেই পড়ে। আর সেখানেই আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যায় বাংলা রূপকথার রাজার নির্বাচনপ্রক্রিয়া এবং তাঁদের কর্মবৈশিষ্ট্য গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার দলপতি থেকে বিবর্তিত হতে হতে সমাজতন্ত্রের জনগণ দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিতে এসে দাঁড়াচ্ছে। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে সিংহাসনের অধিকার কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব, বাংলা তথা ভারতের সামাজিক-ইতিহাসের বিবর্তনের রূপরেখার সাথে বাংলা রূপকথা কীভাবে সামঞ্জস্য রেখে অগ্রসর হয়েছে, সেই আলোচনার প্রয়াস থাকবে।

সূচক শব্দ : সামাজিক ইতিহাস, ক্ষমতার আগ্রাসন, মালিকানা, অধিকার, রাজসিংহাসন, আর্থ-অনার্য, বহির্শক্তি, জনমানস।

প্রতিটি ভাষার রূপকথাই তারিখ হারিয়ে যাওয়া সময় থেকে পরিবর্তমান সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসকে বহন করতে করতে মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাসের পালাবদলের সাক্ষী এই রূপকথাগুলি। গবেষণায় দেখা গেছে আজ থেকে প্রায় ৬০০০ বছর আগেও অর্থাৎ ব্রোঞ্জ যুগের সমসাময়িক কালেও রূপকথার অস্তিত্ব ছিল, যার নাম ‘The Smith and the Devil’ [<https://www.bbc.com/news/uk-35358487>]। সেইসময় থেকে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করতে অভ্যস্ত মানুষ তাঁদের সংগ্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন এই কাহিনিগুলির মাধ্যমে। লোককথার অন্যতম বৈশিষ্ট্যের নিরিখে রূপকথাও কালের নিয়মে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ের কাহিনির সাথে মূলধন করেছে মানুষের সাথে মানুষের দ্বন্দ্বকে, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনকে এবং সর্বোপরি ক্ষমতার আগ্রাসনকে। পরবর্তীতে এইসব মৌখিক কাহিনিকে লেখ্যরূপ দিতে গিয়ে তাতে পড়েছে আধুনিকতার ছাপ ও শিষ্ট মানসিকতার প্রলেপ। নানাসময়ে সংকলিত বাংলা রূপকথাগুলির প্রতি দৃকপাত করলে এই বিবর্তন খুব সহজেই চোখে পড়বে।

বাংলা রূপকথা পাশ্চাত্য রূপকথা থেকে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে বিষয় নির্বাচনের তুল্যমূল্যে। অন্যান্য দেশ তথা ভাষার রূপকথার অনুরূপেই এর চরিত্র হিসেবে দেখা যায় রাজা, রাণী, রাজপুত্র, রাজকন্যা, রাক্ষস-রাক্ষসী এবং অবশ্যই এদের উভয়পক্ষকেই সাহায্য করে প্রকৃতির নানা উপকরণকে ঘিরে নানা রকম অবাস্তব ও অপ্রাকৃতিক কার্যকলাপ। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ বাংলা রূপকথার মূল দ্বন্দ্ব সিংহাসনের দখল। আদতে কেবলমাত্র বাংলা নয় সমগ্র ভারতের ঐতিহাসিক দলিল থেকে আমরা সহজেই সিদ্ধান্তে আসতে পারি বিদেশি তথা বহির্শক্তির

কাছে ভারত অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল; যার জেরে ভারতের রাজনীতি কখনই কোন স্থিতিাবস্থা পায়নি, বারেবারে এর দখলকে কেন্দ্র করে একাধিক শক্তির দ্বন্দ্ব বিধ্বস্ত হয়েছে জনজীবন। আর এরই স্পষ্ট প্রভাব আমরা দেখতে পাই বাংলা রূপকথাতেও। বিভিন্ন সময়ে সংকলিত বিভিন্ন রূপকথাকারের হাতেই বাংলা রূপকথার রাজা-রাজপুত্র-রাজকন্যারা বাংলার ইতিহাসের সাথে সমান্তরালে তাঁদের সিংহাসন জয়ের প্রেক্ষিত এবং শাসক হিসেবে নিজেদের কার্যপদ্ধতির বিবর্তন ঘটিয়ে গেছে কখনও তা সচেতনভাবে সাহিত্যিক রূপকথায়, কখনও আবার নিতান্তই মৌখিক কাহিনির লেখ্যরূপ হিসেবে।

মানবসভ্যতার ইতিহাসের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে দলবদ্ধ মানুষ নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদেই নির্বাচন করেছিল এক ব্যক্তিকে, যে তাদের প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা বন্য জন্তু এবং অন্য গোষ্ঠীর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবে। খুব স্বাভাবিকভাবেই বিপদের সম্মুখীন হয়ে যে ব্যক্তি তাঁর বীরত্ব দিয়ে সকলকে উদ্ধার করতে সক্ষম হতেন, তিনিই হতেন সেই গোষ্ঠীর ‘গোষ্ঠীপতি’; ফলত এই পদটি তখন কারোর জন্যই স্থায়ীপদ ছিল না। বাংলা রূপকথার জগতে উইলিয়ম কেরির সংকলিত ৪০ সংখ্যক রূপকথা ‘হরিণবদনা রাজকুমারী’তে আমরা দেখি, রাজা তাঁর হরিণের মুখ যুক্ত রাজকন্যাকে এক মন্ত্রীপুত্রের সাথে বিয়ে দেন, মন্ত্রীপুত্র রাজকন্যাকে চিত্রকূট পর্বতে এক জলাশয়ে মাথা ডুবিয়ে দিলে পুনরায় রাজকন্যা মানুষের মাথা লাভ করেন এবং উপহারস্বরূপ রাজার অর্ধেক রাজত্ব লাভ করেন। কেবলমাত্র এই রূপকথাতেই নয়, বাংলা রূপকথার এটি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় কাহিনিসূত্র, যেখানে রাজা এবং রাজ্যকে সামান্যতম সমস্যার হাত থেকে যে প্রজা অথবা মন্ত্রীপুত্র অথবা কোটালপুত্র রক্ষা করবে তার হাতেই অর্ধেক রাজত্ব তুলে দেওয়া হয়ে থাকে।

এর পরবর্তী পর্যায়ে শুরু হল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব—বিজয়ী গোষ্ঠী বিজিতদের ওপরে নিজেদের অধিকার কায়ম করল। অধ্যাপক দামোদর কোসাম্বি এই বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছেন—

“গোষ্ঠীর কোন মানুষের কাছে সমাজ বলতে যা কিছু—তা তার নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; অন্য গোষ্ঠীর মানুষকে মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হত না। তাদের কাউকে মেরে ফেলা বা সর্বস্বান্ত করাটা প্রায়শ কর্তব্য হিসেবেই বিবেচিত হত,” [কোসাম্বি ২০০২ : ১৮]

আমরা যদি বাংলা রূপকথার অত্যন্ত জনপ্রিয় ‘ঘুমন্তপুরী’ টাইপ কাহিনিগুলির দিকে তাকাই, আমরা দেখতে পাব রাজ্য ও রাজকন্যা সহ রাজা কোনও অজ্ঞাত কারণে রাক্ষস বা দৈত্যদের হাতে বন্দী এবং ঘুমন্ত—সেই কারণ অবশ্যই এক রাজ্যের অধিকার অপর শক্তিশালী রাজ্যের হাতে চলে গেছে এবং তাদের সাথে ঠিক সেই ব্যবহার করা হচ্ছে কোসাম্বির বক্তব্যের অনুরূপেই—

“রাজকন্যা বলিলেন— “এই পুরী আমার বাপের; রাক্ষসেরা আমার বাপ-মা রাজ-রাজত্ব খাইয়াছে, কেবল আমাকে রাখিয়াছে। যদি আমি পালাইয়া যাই সেই জন্য বাহিরে যাবার সময় রাক্ষসেরা সোনার কাটি রূপার কাটি দিয়া আমাকে মারিয়া রাখিয়া যায়।” ” [মিত্র মজুমদার ১৪২৭, ১৬৮]

এই রাজকন্যাকে যে রাজপুত্র উদ্ধার করছে সে অবশ্যই আরও শক্তিশালী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, যে কিনা অনায়াসেই এর রাক্ষসদের হত্যা করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করছে পূর্ববর্তী ক্ষমতাকে ধ্বংস করে। কিন্তু এইক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, যেখানে সমগ্র রাক্ষসগোষ্ঠী একটি গোটা রাজ্যের ওপর তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করেছে, এখানে একজন রাক্ষস বা রাক্ষসীর প্রাধান্য থাকলেও সে কিন্তু তার গোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি হিসেবেই কাজ করে যায়; তাই যখন,

“বুকের উপর রাখিয়া তালপত্র খাঁড়া দিয়া রাজপুত্র সাপের গলা কাটিয়া ফেলিলেন। এক ফেঁটা রক্তও পড়িতে দিলেন না। সব ফুরাইল, যত রাক্ষস পুকুর পাড়ে আসিতে আসিতেই মুণ্ডু খসিয়া পড়িয়া গেল।” [মিত্র মজুমদার ১৪২৭, ১৭২]

অর্থাৎ কিনা এখনও পর্যন্ত কোন ব্যক্তিগত মালিকানা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে গোষ্ঠী বড় হচ্ছে; এইভাবেই গড়ে উঠল কৌম বা উপজাতি শাসনব্যবস্থা। এক্ষেত্রেও রাজার পদ নিতান্তই ‘সামরিক নেতা’র মতই, যেখানে রাজা গোষ্ঠীর একটি অংশমাত্র। তার কোন নির্দিষ্ট জমি ছিল না, ছিল না কোন কর; গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকে প্রাপ্ত সম্পদের সমান অংশ তার প্রাপ্য [থাপার ১৯৬০, ২০]। এই শাসনব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই রাজা ও প্রজাদের মধ্যে কোনরকম দূরত্ব ছিল না, সকলের নিরাপত্তা ও সুখই ছিল গোষ্ঠীপতির মূল কাম্য। নবনীতা দেবসেনের রূপকথা ‘দয়ালু রাজা’তে তাই দেখা যায় এমন এক রাজা, যিনি সকল সেরা জিনিস কিনে তাঁর প্রজাদের কাজে তা বিলিয়ে দেন, রাজমুকুট নয়, জুইয়ের মালা মাথায় পড়ে রাজ্য পরিক্রমায় যান; একবার এক গরিব বামুনের বোবা মেয়েকে উদ্ধার করতে বিয়ে করে আনেন। আবার ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র ‘কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা’ রূপকথায় রাজা ও রাখালের বন্ধুত্ব, নিরাপত্তাহীন রাণীর একাকী স্নানে যাওয়ার ঘটনা এই সময়েরই নিশ্চিত সাক্ষী। কিন্তু এই একই রূপকথায় আমরা দেখলাম—

“রাজপুত্র রাজা হইলেন। রাজা রাজপুত্রের কাঞ্চনমালা রাণী, ভাণ্ডার ভরা মানিক, কোথাকার রাখাল, সে আবার বন্ধু! রাজপুত্রের রাখালের কথা মনেই রহিল না।

একদিন রাখাল আসিয়া রাজদুয়ারে ধর্না দিল, “বন্ধুর রাণী কেমন, দেখাইল না।” দুয়ারী তাহাকে “দূর দূর” করিয়া খেদাইয়া দিল। মনের কষ্টে রাখাল কোথায় গেল, কেহই জানিল না।” [মিত্র মজুমদার ১৪২৭, ৬৮]

এই বদল আসলে সমাজবদলের ইঙ্গিত। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে ধারাবাহিক ইতিহাস রয়েছে সেখানে আমরা দেখি বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে পারিবারিক গঠনের বিবর্তন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। একেবারে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলিতে যখন যৌনসম্পর্ক স্থাপন ও সন্তান উৎপাদনের কোন বিধি-নিষেধ ছিল না তখন অধিকৃত এবং উৎপাদিত সম্পদের বাঁটোয়ারা কেন্দ্রিক কোন জটিলতাও ছিল না; যেহেতু তখন গোষ্ঠী ও পরিবারের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না, ছিল ‘সঙ্গম পরিবারের’ ধারণা। এরপরে সমাজে এল ‘জোড় পরিবারের’ ধারণা, যেখানে সন্তান আর গোষ্ঠীর নয়, বিশেষ পিতা-মাতার সন্তানের স্বীকৃতি পেল এবং ফলস্বরূপ প্রথমে মাতৃবংশ ও পরবর্তীতে পিতৃবংশের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির বন্টন শুরু হল।

“But to whom did this new wealth belong? Originally, undoubtedly, to the gens... With the introduction of cattle breeding, of the working of the metals, of weaving and, finally, of field cultivation, this changed. Just as the once so easily obtainable wives had now acquired an exchange value and were bought, so it happened with labour power, especially after the herds have finally been converted into family possessions. The family did not increase as rapidly as the cattle. More people were required to tend them; the captives taken in war were useful for just this purpose, and, furthermore, they could be bred like cattle itself.

Such riches, once they had passed into the private possessions of families and there rapidly multiplied, struck a powerful blow at a society founded on pairing marriage and mother-right gens.

...On the death of the herd owner, therefore his herds passed, first of all, to his brothers and sisters and to his sister's children or to the descendants of his mother's sisters. His own

children, however, were disinherited.

Thus, as wealth increased, it, on the other hand, gave the man a more important status in the family than the woman, and, on the other hand, created a stimulus to utilize this strengthened positions in order to overthrow the traditional order of inheritance in favour of his children. But this was impossible as long as descent according to the mother right prevailed. This had, therefore, to be overthrown, and it was overthrown; ... in the Semitic form, this family chief lives in polygamy, the bondsman has a wife and children, and the purpose of the whole organization is the care of flocks and herds over a limited area.” [Engels 1977, 54-58]

এই প্রসঙ্গের উত্থাপন থেকে সহজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় পারিবারিক তথা গোষ্ঠীর পরিসর এখন সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। যার ফলস্বরূপ রাজা হলেন আর্থিক দপ্তে বলীয়ান ও স্বৈরাচারী; বিভেদ এল মানুষে মানুষে। এরই প্রতিফলন আমরা দেখলাম ‘কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা’ গল্পে রাজা ও রাখালের পারস্পরিক সম্পর্কে। অর্থাৎ, এবার সমাজে ক্ষমতার লড়াই শুরু হল শারীরিক প্রতিপত্তি নয়, আর্থিক সম্পত্তির ভিত্তিতে। সম্পত্তির মালিকানা বদলের সাথে সাথে সমাজে তৈরি হয়ে গেল কতকগুলি শ্রেণি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র; যাদের কর্মকাণ্ড একটি নির্দিষ্ট ছকে বাধা পড়ল। ফলত সমাজব্যবস্থাতেও এক বিশাল পরিবর্তন সূচিত হল—

“In the wake of caste and property came the state. The place of the *Vis* was taken by the *rastra* (country), the *Vispati* (patriarch) became *Bhupati* (lord of the land). The *Kulapatis* (paterfamilias) who were shares in the tribal commonwealth were replaced by *Amatyas* (officers and councilors), paid men of the king. The state protected private property and took a part of private income as *revenue* (bhaga). It had no hand in social regulation and was only the guardian of the rules of duty (dharmasya gopta).” [India 2021, 10]

গোষ্ঠীর রাজার রাষ্ট্রের রাজ্যে পর্যবসিত হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ রাজাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ তাঁর খামখেয়ালিপনাতে পরিণত হল, যার প্রতিচ্ছবি বাংলা রূপকথাতেও ফুটে উঠল। দীপাঙ্ঘিতা রায় ‘আমের নাম চন্দ্রকেতু’তে আঁকলেন এক রাজ্যের চিত্র...

“মুশকিল হচ্ছে অভাব নেই কিন্তু তবু সুখও নেই হেতমপুরের মানুষের। দেশের রাজা ভালো মানুষ নন। সারাক্ষণ তাঁর মাথায় শুধুই দুষ্টবুদ্ধি বিজবিজ। প্রজারা ভালো আছে, সুখে আছে এটা রাজার মোটেই পছন্দ নয়। নানারকমভাবে তাদের অসুবিধায় ফেলতে পারলে তিনি খুশি হন। কারণে-অকারণে অত্যাচারও করেন নানারকম। তাঁর আবার এক মন্ত্রী আছে, দুষ্টবুদ্ধিতে যিনি আরও এককাঠি সরেস। দু-জনে মিলে শলা করে মাঝে মাঝেই প্রজাদের নানারকম বিপদে ফেলতে চেষ্টা করেন। ...

একবার রাজবাড়ির প্রধান পাচক এসে রাজার কাছে নালিশ জানাল। ভোলা জেলে নাকি সেদিন বাজারে একখানা বিশাল তাজা রুই মাছ এনেছিল। কিন্তু রাজবাড়ির রসুইখানার জন্য চাওয়া সত্ত্বেও ভোলা সে মাছ বিক্রি করেনি। মাছ নাকি বায়না করা আছে কোন চাষির মেয়ের বিয়ের জন্য।

শুনেই তো রাজা রেগে আগুন। অমনি হুকুম দিলেন। আজ থেকে মধুমতি নদীতে মাছ ধরা বন্ধ। মরুক ব্যাটা জেলের দল না খেয়ে।” [রায় ২০১৮, ২১]

এই ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবনতায় রাজা তথা শাসকের সাথে প্রজাদের মধ্যে এল এক বিশাল অনতিক্রম্য দূরত্ব। কেবল রাজা-প্রজা নয়; এই বিভেদ সৃষ্টি হল রাজার সাথে রাজকর্মচারীদের মধ্যেও। এরই প্রভাবে ‘ঠাকুমার বুলি’ সংকলনের

‘সোনার কাটি রূপার কাটি’ রূপকথায় আমরা দেখলাম এক রাক্ষস অর্থাৎ বিরুদ্ধশক্তির আক্রোশের প্রথম শিকার হচ্ছে কোটালপুত্র, তারপর সওদাগর পুত্র এবং অবশেষে মন্ত্রীপুত্র; রূপকথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির নানা অপ্রাকৃতিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাজপুত্র কিন্তু সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাচ্ছে। বাংলা রূপকথার মাধ্যমেই আমাদের চোখে পড়ল আরও এক সামাজিক পরিবর্তন, যেখানে রাজকন্যাকে অনায়াসেই অচেনা মানুষের সাথে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিত, তা বদলে গেল— ‘পুষ্পমালা’ রূপকথায় রাজা রাজকন্যার সাথে কোটালপুত্রের বিয়ে দিতে অস্বীকার করছেন।

উত্তর ভারতে মৌর্য আমলেই এই কর্মচারীকেন্দ্রিক রাষ্ট্রতন্ত্র গড়ে উঠতে শুরু করেছিল বলে অনুমান করা হয় এবং সেখান থেকেই ধীরে ধীরে তা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তারলাভ করে [রায় ১৪২০, ২০৩]। ইতিমধ্যে বাংলা রূপকথায় একটি প্রবণতা দেখা দিল। ‘শীত-বসন্ত’, ‘ঠাকুরমার ঝুলি’তে সংকলিত ‘ডালিমকুমার’, শিবনাথ শাস্ত্রীর সংকলনের ‘আশ্চর্য ছুতোরের গল্প’ তে আমরা দেখলাম পাটহাতি দ্বারা রাজা নির্বাচনের কাহিনি—

“রাজসিংহাসন পিঠে শ্বেত রাজহাতী, পৃথিবী ঘুরিয়া কাহারও কপালে রাজটিকা দেখিল না। শেষে ছুটিতে ছুটিতে, যে বনে শীত বসন্ত, সেই বনে, আসিয়া দেখে, এক রাজপুত্র গায়ের চাদর ভিজাইয়া সরোবরে জল নিতেছে। রাজপুত্রের কপালে রাজটিকা। দেখিয়া, শ্বেত রাজহাতী অমনি শুঁড় বাঁড়াইয়া শীতকে ধরিয়া সিংহাসনে তুলিয়া নিল।

...শ্বেত রাজহাতীর পিঠে শীত তো সেই নাই-রাজার রাজ্যে গেলেন! যাইতেই, রাজ্যের যত লোক আসিয়া মাথা ছোঁয়াইল, মন্ত্রী আমাত্য, সিপাইসাত্ত্বীরা সকলে আসিয়া মাথা নোয়াইল, নোয়াইয়া সকলে রাজসিংহাসনে তুলিয়া নিয়া শীতকে রাজা করিল।” [মিত্র মজুমদার ১৪২৭, ৭৮-৮১]

আসলে ইতিমধ্যে সমাজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। সমাজে নিজেদের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের দেবতার সাথে মানুষের সংযোগরক্ষাকারী দূত হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা রাজপদকে ব্যবহার করেছেন নিজেদের সুবিধার্থে। এই পুরোহিতস্থানীয়রা ঘোষণা করলেন, “যুদ্ধজয়ের জন্য দেবতারাই রাজা নির্বাচন করতেন। এবং নির্বাচিত রাজা কিছু বিশিষ্ট ভগবদ্ভক্ত গুণের অধিকারী হতেন।” [থাপার ১৯৬০, ২০] আর এখান থেকেই শুরু হল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পারস্পরিক বোঝাপড়া। পুরোহিতদের সহায়তাতেই রাজপদ হল বংশানুক্রমিক এবং রাজসভায় সুনিশ্চিত হল পুরোহিতের পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ল উভয়পক্ষেরই। আর উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গেই শুরু হতে লাগল আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, ভ্রাতৃহত্যা। এবার যদি আবার বাংলা রূপকথার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যায়, আমরা দেখব এর অধিকাংশ গল্পেই সুয়োরানী ও দুয়োরানীর দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়; একে আমরা অনায়াসেই বহুবিবাহের সপত্নী সমস্যার মধ্যেই আটকে রাখতে পারি। কিন্তু এদের যে লড়াই তা কেবলমাত্র রানীমায়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রাজপুত্রদের প্রতি অন্যায়বিচারে গিয়ে দাঁড়ায়। রাজপুত্রদের হাতে ভবিষ্যতে অবশ্যই আসবে রাজসিংহাসন এবং সম্পত্তির মালিকানা। সুতরাং দ্বন্দ্বের মূল বীজ লুকিয়ে থাকছে এই ক্ষমতার হস্তান্তরের মধ্যেই। প্রমাণস্বরূপ অবন ঠাকুরের ‘ক্ষীরের পুতুল’-এর দুইটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

“সুয়োরানি বললেন—না ভাই, বাঁচতে আর সাধ নেই। আজ বাদে কাল দুয়োরানির ছেলে হবে, সে ছেলে রাজ্য পাবে! লোকে বলবে, আহা, দুয়োরানি রত্নগর্ভা, রাজার মা হল! আর দেখ না, পোড়ামুখী সুয়োরানি মহারাজার সুয়োরানি হল, তবু রাজার কোলে দিতে ছেলে পেলে না! ছি! ছি! অমন অভাগীর মুখ দেখে না, নাম করলে সারাদিন উপোস যায়! ভাই, এ গল্পনা প্রাণে সবে না। তুই বিষ দে, হয় আমি খাই, নয়তো সতীনকে খাওয়াই!” [ঠাকুর ২০১৭, ৩১-৩২]

আবার কাহিনির শেষে রূপকথার সব পেয়েছি হৃদিশের পরের অংশ—

“রাজা এসে ছেলেকে রাজ্য যৌতুক দিলেন, সেই রাজ্যে বানরকে মন্ত্রী করে দিলেন, আর ছেলের বউকে মায়া রাজ্যের সেই আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, দশশো ভরি সোনার সেই দশগাছা মল পরিয়ে দিলেন।...

হিংসেই ছোটরানি বুক ফেটে মরে গেল।” [ঠাকুর ২০১৭, ৪৭]

ধীরে ধীরে এই মালিকানা কেন্দ্রিক হানাহানির রেশ ভাইয়েদের মধ্যেও প্রবাহিত হল। প্রথমে বিমাতার সন্তানদের লড়াই, ঠিক যেমনটা দেখি ‘কলাবতী রাজকন্যা’তে, পরে তাই সহোদরদের মধ্যেও বাসা বাঁধল, ইতিহাস তার নির্মম সাক্ষী।

সুকুমার রায় রচিত রূপকথা ‘এক বছরের রাজা’তে রাজ্যবাসী এক বছরের জন্য রাজা নির্বাচন করে এবং তাঁকে একবছর পরে নির্বাসিত করা হয়। আমরা যদি এই সময়ের বাংলার ইতিহাসের দিকে তাকাই, দেখতে পাব—“কিন্তু শশাঙ্কর মৃত্যুর পর একশ বছর কেটেছে আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্ব আর বহিঃশত্রুর আক্রমণে, অরাজকতায় আর মাৎস্যন্যায়ে; প্রবল করেছে অত্যাচার দুর্বলের ওপর, বড় মাছ খেয়েছে ছোট মাছকে। তারপর দীর্ঘকালের রক্তপাত আর শোষণ আনল গণতান্ত্রিক সমাজবোধ ও শান্তির জন্য স্বার্থত্যাগ। অষ্টম শতাব্দীর ভারতে এ এক বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। দেশে নেতারা ও জনসাধারণ সমস্ত বিরোধ বিসর্জন দিয়ে গোপালকে করলেন রাজপদে নির্বাচন আর এই শুভবুদ্ধি আনল বাংলায় এক অভাবনীয় যুগান্তর।” [ঘোষ ২০১৭, ১৪] এই ঘটনার প্রতিফলন দেখতে পেলাম পূর্বোল্লিখিত রূপকথায়, জনগণের নির্বাচিত এক বছরের রাজা সারাজীবন রাজত্ব করলেন। পরবর্তী ভারত ও বাংলার ইতিহাসে বহিঃশত্রুর একের পর এক আক্রমণ, রাজনীতির দ্রুত পটপরিবর্তন বাংলা রূপকথায় এক রাজ্যের ওপর অপর রাজ্যের আক্রমণ বা রাক্ষসতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজপুত্রের অভিযানের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। অবশ্য এইসময় রাজারা বহিঃশত্রুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়া ও মিত্রশক্তি গঠনের মধ্য দিয়ে মরিয়া চেষ্টা করছিলেন ক্ষমতাকে নিজেদের করায়ত্ত রাখার। ‘মধুমালার’ রূপকথায় তারই আভাস পেলাম আমরা, যেখানে রাজপুত্র মধুমালাকে লাভ করবেন বলে অন্য তিন রাজ্যের রাজকন্যাকে বিয়ে করছেন, তাঁদের কথোপকথন কিছুটা এইরকম—

চন্দ্রকলা— “স্বামী, সাত নদীর কিনার পাড়ে আর এক রাজকন্যা পঞ্চকলা, তুমি তার কাছে যাও, মধুমালার খোঁজ সেই দিবে।” [মিত্র মজুমদার ১৪২৩, ৩৮]

পঞ্চকলা “স্বামী, মধুমালার খোঁজ তো আমি দিতে পারিব না, আর এক রাজকন্যা আছেন চন্দ্রকলা, মধুমালার সম্বান তিনি দিবেন। রাত ভোর হোক, লোক লস্কর তোমার সাথে দিবে।”

মদন বলিলেন, “রাজকন্যা, লোক-লস্কর আমি নিব না। পথের নিশানে চোক রাখিও, আমি আসিব।” [মিত্র মজুমদার ১৪২৩, ৩৯]

চন্দ্রকলা “স্বামী। পিতা আমার যত ধন যৌতুক দিবেন, কিছু তুমি নিও না, স্বর্ণমন্দিরের চূড়ায় যে ময়ূরটি আছে, কেবল তুমি সেইটি চাহিও।” [মিত্র মজুমদার ১৪২৩, ৪১]

বলাইবাছল্য এইভাবেই রাজপুত্র মধুমালার কাছে পৌঁছেছেন। কিন্তু রাজা নির্বাচনের জন্য ইতিহাস ও রূপকথা উভয়ক্ষেত্রেই ক্ষমতার আশ্ফালনই ছিল শেষ কথা, যার মধ্যে সেইভাবে কোনও বৈচিত্র্য ছিল না।

এরপর ভারত তথা বাংলার ক্ষমতায় এল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি; অর্থাৎ বনিকতন্ত্র এবার ক্ষমতার সিংহাসন দখলের মরিয়া চেষ্টায় ব্রতী। দীনেশচন্দ্র সেন ময়মনসিংহ গীতিকার ‘কাজলরেখা’ পালায় প্রচলিত রূপকথার সূঁচ রাজার কাহিনি লিপিবদ্ধ করলেন; যেখানে দেখা যায় সওদাগর তাঁর কন্যাকে মৃত একাকী রাজার সাথে বিয়ে দেন। এইখান থেকে বনিকতন্ত্রের রাজতন্ত্রে প্রবেশের সূচনা। নবনীতা দেবসেন যখন ‘রাজকুমার বৃষস্কন্ধ আর শ্রীময়ী’ রূপকথা লিখছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি বনিক ছলনার সাহায্যে রাজপুত্রের সমস্ত সম্পদ হরণ করে তাঁকে বন্দী করছে। আর ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি—

“Taking advantage of the collapse of the Mughal empire and the rise of a number of warring principalities contending for authority across Eighteenth-century India, the British had subjugated a vast land through the power of their artillery and the cynicism of their amorality. They displaced the nawabs and maharajas for a price, emptied their treasuries as it pleased them, took over their states through various methods (including from the 1840s the cynical ‘doctrine of lapse’ whenever a ruler died without an heir), and stripped farmers of their ownership of the lands they had tilled for generations.” [Tharoor 2016, 24]

সুতরাং, ভারতের ইতিহাসে এখন বনিকতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত; আর তাই বাংলা রূপকথায় শোনা গেল রাজপুত্রদের বদলে সওদাগর পুত্রদের অভিযানের কাহিনি। ইত্যাবসরে শরদ্দিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আঙুর-পরী ডালিম-পরী’ রূপকথা পড়লে দেখতে পাই, বাংলা রূপকথার এক ব্যতিক্রমী চিত্র—

“এক রাজা। প্রকাণ্ড তাঁর রাজ্য। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাঙারে সোনা-দানা, হীরা-মুক্তার ছড়াছড়ি। রাজার প্রতাপে রাজ্য গমগম। রাজ্যটি কিন্তু রাজার নিজের নয়; অপর এক রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন পুরনো রাজা-রানীকে কেটে, তাঁদের রাজ্য নিষ্কণ্টক ভোগ করছেন।

...তারপর অনেকবছর কেটে গেছে। পুরনো রাজা-রানী আর রাজকন্যাদের কথা কারো মনে নেই। নতুন রাজা রাজত্ব করেন।” [মাঘহার ২০১৬, ১০৪]

অন্যরাজ্যের ক্ষমতা করায়ত্ত করতে আর রাক্ষস বা দৈত্যদের সাথে নয় লড়াই করতে হচ্ছে দুই মানুষের, দুই রাজার। রাজাদের মালিকানা দখলের নেশা আজ বিশ্বকে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে।

অস্ত্রের বানবানানি থেকে মুক্তি দিয়ে সুস্থ রাষ্ট্রের স্বপ্নেই গণতন্ত্র নেমে এসেছিল ইতিহাসের পাতায়। নবনীতা দেবসেনের রূপকথায় তাই অস্ত্র নয় বুদ্ধি, শোষণ নয় ভালোবাসাই হল মূলধন। ইতিমধ্যে সিংহাসনের মালিকানা কেবল রাজপুত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি রাজকন্যাদেরও এনে বসিয়েছেন সিংহাসনে; তাঁদের রীতিমতো প্রস্তুতি নিতে হয়েছে সিংহাসনে বসার অধিকার পেতে—

“রাজা তাকে তাঁর জানা সব বিদ্যে শেখাচ্ছেন, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন, রাজধর্ম, অস্ত্রবিদ্যা। আর যদি শেখাচ্ছেন তাঁর প্রিয় বিদ্যে ছবি আঁকা, নাচগান, গল্প-কবিতা পড়া, পাখি পশুকে মায়ামত্যা করা। রান্নাবান্না, ঘরের কাজ তো সবাই শিখে যায়। আর বনহংসী নিজে নিজেই শিখে ফেলেছে খিড়কির পুকুর সাঁতরে এপার ওপার করতে, আমগাছে পেয়ারাগাছে চড়তে। কেবল সে বড় হয়েও কোনো দিনই মুগয়া করতে যাবে না রাজামশাইকে বলে দিয়েছে। পশুপাখিদের মারার কথা ভাবতেই তাঁর প্রাণে খুব কষ্ট হয়। অস্ত্রবিদ্যাই সে শিখতে চায়নি, কেন না যুদ্ধ করা আসলে খারাপ। মানুষ মারার কাজ। এই কথা শিখিয়েছেন তাঁকে রানিমা। কিন্তু মন্ত্রীমশাই বলেছেন বনহংসীকে সব বিদ্যাই শেখাতে হবে, বড় হলে সে-ই সিংহাসনে বসবে। মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার মতো তাকেও একাধারে রাজা আর রানি দুই-ই হতে হবে তো?” [দেবসেন ২০১১, ১৫৭]

এবার যখন ইতিহাস গণতন্ত্রকে বরণ করে নিল, তখন দীপাঙ্ঘিতা রায় তাঁর রূপকথায় এই উত্তরাধিকারীকেও পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন করে নিলেন ‘এক যে ছিল রানী’ নামক রূপকথায় রাজা নির্দেশ দিলেন, রাজকন্যাদের ছোঁড়া তীর যেখানে পরবে সেখানে পাঁচ বছর থেকে শিক্ষা নিয়ে ফিরে আসা। বড়কন্যার তীর পড়ে এক চাষার বাড়ি, মেজকন্যার এক তাঁতীর বাড়ি এবং ছোটকন্যার এক ফাঁকা মাঠে। সেই জনশূন্য মাঠে সামান্য কয়েকটি মোহর এবং সর্বোপরি নিজের বুদ্ধিমত্তাকে সম্বল করে পাঁচ বছরে রাজকন্যা হিরণমালা সেখানে কীভাবে এক জমজমাট গ্রাম পত্তন করে তার সর্বময় কতী হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় এই রূপকথা। স্বাভাবিকভাবেই বাবাও রাজ্যের ভার তার ওপরে দেন।

কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা নির্বাচনের ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরিয়ে জনমানস সাধারণ প্রজাদের থেকে শাসক নির্বাচনের দায়িত্ব নিলে, ‘রাজা হওয়ার গল্প’ রূপকথায় দেখা গেল—দেশের অপূত্রক রাজা রাজ্যের ভার কার হাতে তুলে দেওয়া হবে, তার জন্য শৌর্য-বীর্য-বিদ্যাবুদ্ধির প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। অনেক প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে শেষ পর্যন্ত বনিকপুত্র হেমজিৎ এবং কৃষ্ণকলিকে রাজা তিনটি শেষ প্রশ্নের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলেন ঠিক করেন; সেই তিনটি প্রশ্ন হল, ‘তুমি যদি রাজা হও, তাহলে সেই আনন্দ উদ্‌যাপন করবে কীভাবে?’ ‘রাজা হওয়ার পর তুমি কোনদিকে সব থেকে বেশি মনোযোগ দেবে?’ ‘তুমি যদি খবর পাও পাশের রাজ্যের রাজা তোমার রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে, তাহলে কী করবে?’ এই সকল প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধিমত্তা ও মানবিকতার সাথে দিয়ে কৃষ্ণকলি রাজা নির্বাচিত হয়। দীপাঘিটা দেখালেন সিংহাসন বনিকদের নয় চাষির মেয়ে অর্জন করল; অর্থাৎ শাসনভার এখন সাধারণ মানুষের হাতে এল। সেই সাধারণ চাষীর মেয়ে রাজা হয়ে সেই বিশাল রাজপ্রাসাদ একজন মানুষের জন্য নয় বলে,

“নতুন রাজার জন্য তিনটি কামরা রেখে, বাকি প্রাসাদের কোথাও হল অতিথিশালা, কোথাও পণ্ডিতরা বসলেন ছাত্র পড়াতে, কোথাও আবার দেশ-বিদেশের শিল্পীরা এসে নাচ-গানের আসর বসালেন।” [রায় ২০১৯, ৩৯]

তাঁর অপর এক গল্প ‘বাজি রইল মালপো’তে তিনি আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন। এই রূপকথা যে সমস্যাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে, তা রূপকথার ইতিহাসে প্রথম রাজার চার ছেলে-মেয়ে থাকা সত্ত্বেও রাজার দুশ্চিন্তা তাঁর অবসরের পরে কার হাতে পলাশপুরের দায়িত্ব দেওয়া হবে? তাঁর বড় ছেলে সুদেবের আগ্রহ কবিরাজিতে; বড় মেয়ে সুগতা অসাধারণ চিত্রশিল্পী; মেজ মেয়ে সুমেধা বহুদিন গুরুগৃহে থেকে পড়াশোনা করেছেন, তাঁর আগ্রহ ইঁট-কাঠ-পাথর নিয়ে, যাকে আমরা বলি ‘সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং’ এবং ছোট রাজকুমার সূর্য সঙ্গীতশিল্পী প্রথমেই রাজপুত্র-রাজকন্যাদের এই বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ একেবারেই আধুনিক মানুষের পেশা গ্রহণের ভাবনার অনুরূপ, যা পারিবারিক উত্তরাধিকারকে বহন না করে নিজস্বতাকে স্বীকার করে। এই চারজনকে বাদ দিয়ে রাজা মনে করেছেন এমন কাউকে রাজ্যের দায়িত্ব দেবেন, যিনি সাধারণ মানুষ, রাজা নানাভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে সেই মানুষকে নির্বাচন করবেন এবং তাকে প্রয়োজনীয় সমস্তরকম শিক্ষা দেওয়া হবে। এই বিষয়ে রাজার সিদ্ধান্ত যেমন অভিনব তেমনই যুক্তিসঙ্গত—

“আসলে আমি অনেক ভেবে দেখেছি যে, আমার ছেলে-মেয়েরা সকলেই খুব গুণী। কিন্তু তারা কেউই ঠিক রাজা হওয়ার উপযুক্ত নয়। তারা নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে। রাজা হলে কিন্তু তাদের রাজকার্যে মন দিতে হবে। প্রজাদের কথা ভাবতে হবে। নিজের পছন্দের কাজে ডুবে থাকলে চলবে না। আমার মনে হয় না সেটা তাদের কার্যরই খুব ভালো লাগবে। যদি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে রাজ্যের দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আর যাইই হোক, ভালো রাজা তারা কখনই হতে পারবে না। আর আমিও আমার প্রিয় প্রজাদের ভার তাদের ওপর দিয়ে নিশ্চিত হতে পারব না। ...রাজপুত্রকেই যে রাজা হতে হবে তার কি মানে আছে? রাজা হওয়ার গুণ যার মধ্যে আছে, সেই তো রাজা হবে। আর আমার ছেলে-মেয়েরা বিদ্বান-বুদ্ধিমান। তাদের অন্যের ওপর নির্ভর করতে হবে কেন?” [রায় ২০১৮, ৪]

রাজা নির্বাচন করতে আগের গল্পের মতোই মানদণ্ড রেখেছিলেন, তবে তিনি সম্প্রচার করে এই পরীক্ষা নেওয়ার আয়োজন করেননি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে রোজকারের দিনযাপনের অভ্যাসের ভিতর থেকে নির্বাচন করেছেন যোগ্য রাজা পদ্ধিকে। আসলে আমাদের এই সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে লেখক হয়তো উপলব্ধি করেছেন, নিজেদের সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থাপন করার সুযোগ নিয়ে নির্বাচিত রাজাদের হাতে রাজ্য বা প্রজা কেউই সুরক্ষিত

নয়, যা আদতে রাজার কাম্য ছিল। আর তিনি যে ফুলওয়ালির মেয়ে পদ্মকে নির্বাচন করে ভুল করেননি, তার প্রমাণ পাঁচবছর পরে তাঁর রাজ্যে ব্যাবসা-বাণিজ্যের রমরমা; প্রজাদের জন্য চিকিৎসা, পরিবহনের সুব্যবস্থা; সাজানো-গোছানো পরিপাটি পরিবেশ; সর্বোপরি ছোটদের সার্বিক বিকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত। এই শাসন ব্যবস্থাই তো জনমানসের ঈঙ্গিত, যা থেকে এখনও আমরা বঞ্চিত। তাই রূপকথার যা আসল বৈশিষ্ট্য—হার না মেনে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখানো এই রূপকথা আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সাধারণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখার সাহস দেয়।

সমগ্র আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলা রূপকথার জগত কীভাবে ইতিহাসের পটপরিবর্তনের সাথে তাল রেখে ক্রমাগত বদল এনেছে তার রাজার নির্বাচন প্রক্রিয়ায়, রাজা-রানী-রাজপুত্র-রাজকন্যার চারিত্রিক গঠনে, তাঁদের কার্যপ্রণালীতে। বাংলা রূপকথার রাজা পিতৃতান্ত্রিকতা থেকে মাতৃতান্ত্রিকতা পেরিয়ে আধুনিক সময়ের Gender equality-তে পদার্পণ করেছে; রাজতন্ত্রের চোখরাঙ্গানিকে সময়ের সাথে সাথে বদলেছে বণিকতন্ত্রে এবং সেখান থেকে পৌঁছেছে সাধারণতন্ত্রে; অর্থের গরিমাকে নস্যাৎ করে শিক্ষা-সহবত-মানবিকতাকে গুরুত্ব দিয়েছে; অনায়াস ক্ষমতা লাভের পরিবর্তে বেছে নিয়েছে যোগ্যতার লড়াই।

গ্রন্থপঞ্জী

আরও গ্রন্থ

- ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। ১৯৮৬। ক্ষীরের পুতুল, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
- দেবসেন, নবনীতা। ২০১১। রূপকথা সমগ্র, কলকাতা: পত্রভারতী।
- মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন। ১৪২৭। ঠাকুরমার ঝুলি, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।
- মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন। ১৪২৩। ঠাকুরদাদার ঝুলি, কলকাতা: কামিনী প্রকাশ।
- রায়, দীপাঙ্ঘিতা। ২০১৮। ইচ্ছেপরিচয় রূপকথা, কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ।
- রায়, দীপাঙ্ঘিতা। ২০১৯। সোনালি রূপোলি রূপকথা, কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ।
- সম্পা মায়হার, আহমাদ। ২০১৬। বাংলা ভাষার সেরা রূপকথা, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্যকেন্দ্র প্রকাশনা।

সহায়ক গ্রন্থ

ইংরেজি

- Engels, F., 1977. *The Origin of the Family, Private Property and the State*. Moscow: Progress Publishers.
- India : Society, Religion and Literature in Ancient and Medieval Periods, 2021. New Delhi: Publication Division.
- Tharoor, Shashi. 2016. *An Era of Darkness : The British Empire in India*, New Delhi: Aleph Book Company.

বাংলা

- কোসাম্বি, দামোদর ধর্মানন্দ, ভারত ইতিহাস চর্চার ভূমিকা, অনুবাদ মিত্র, গৌতম, ২০২১। কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী।

গোষ্ঠীতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র : বাংলা রূপকথায় রাজা নির্বাচনের প্রেক্ষিত

- ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র। ২০১৭। বাঙালী। ঢাকা: সুবর্ণ প্রকাশন।
- থাপার, রোমিলা, ১৯৬০। ভারতবর্ষের ইতিহাস (১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ- ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ), অনুবাদ গুপ্ত, কৃষ্ণ। কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান।
- রায়, নীহাররঞ্জন। ১৪২০। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

Internet Link

- <https://www.bbc.com/news/uk-35358487>

লেখক পরিচিতি :

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

Email ID : ditipriyadasgupta6554@gmail.com